রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি তোলার বৃত্তান্ত

নরেশ গুহ

উনিশশো উনচল্লিশ সালের মার্চ মাসে, আমার বয়স যখন ষোলো, তখনকার পূর্ববাংলা থেকে আমি কলেজে পড়তে কলকাতায় চ'লে আসি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্রই কয়েক মাস আগে। যুদ্ধ বাধে সেপ্টেম্বর মাসে, যদিও তার ভয়ঙ্কর উত্তাপ এদেশে এসে পৌঁছতে তখনো কিছু বিলম্ব ছিলো। কলকাতায় এসেই আমামর পাখা গজায়, এবং এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে প্রথমেই আমি স্থির ক'রে ফেলি যে আমরা সে-বছরই শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় গিয়ে, সম্ভব হ'লে রবীন্দ্রনাথকে একবারটি প্রণাম করে আসবো। কলকাতা থেকে সবাই ট্রেনে করেই সচরাচর বোলপুর যাতায়াত ক'রে থাকেন। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে সদ্য শহরে আসা কমবয়সী এবং মোটামুটি গ্রাম্য আমাদের পক্ষে অভিপ্রায়টা ছিলো খানিকটা অন্য রকমের। আমরা ঠিক করলাম যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেকে প্রথমবার চাক্ষুষ দেখতে যেতে হ'লে কক্ষনো ট্রেনে চেপে যাওয়া চলবে না। আমরা যাবো সে-কালের তীর্থযাত্রীদের ধরনে পায়ে হেঁটে। রাস্তাঘাট কিছুই জানা ছিলো না। শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়ে সেই দুর্দান্ত পৌষের শীতে কোথায় যে থাকা হবে তাও ছিলো আমাদের অজানা। শোনা গেলো, শান্তিনিকেতন আশ্রমে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী নামে এক সহৃদয় ব্যক্তি বাস করেন যিনি হয়তো আতিথ্যের ব্যাপারে আমাদের সহায় হ'তে পারবেন। কাজেই তাঁর আনুকূল্য প্রার্থনা করে অচিরাৎ চিঠি রওনা করে দেওয়া গেলো। কিন্তু যথা সময়ে হলেও সে-চিঠির তিনি যে-উত্তর দান করলেন তা আমাদের সমস্ত উৎসাহ উদ্যমের সমাপ্তি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। মেদিনীপুর থেকে ১৫/১২/৩৯ তারিখে লেখা সুধাকান্তবাবুর সেই চিঠিটি ছিলো এইরকমঃ

'সবিনয় নিবেদন,

আপনার তারিখবিহীন চিঠি বোলপুর হইতে রিডাইরেকটেড হইয়া অদ্য এখানে আমার কাছে আসিয়াছে। এবার পৌষ-উৎসবে বিশেষ কারণে, গেস্ট হাউসে স্থানাভাব থাকিবে এবং নিমন্ত্রিত অতিথি ব্যতীত অন্যদের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না বলিয়াই জানি। আমি আজকাল শান্তিনিকেতনে অধিকাংশ সময় থাকি না— এবং অতিথিদের সেখানে থাকিবার ব্যবস্থাও আমার হাতে নাই। এই কারণে, আমার পক্ষে উৎসব কালে কাহারো জন্য কোনা ব্যবস্থা করা সাধ্যাতীত। আপনি যদি সেখানে উৎসবের সময় যাইতে চান তাহা হইলে শান্তিনিকেতন সচিব মহাশয়কে চিঠি লিখিয়া সব খোঁজ লইবেন। বিছানাপত্র যাহা প্রয়োজন সঙ্গে না নিলে দুর্ভোগে পড়িবেন। কারণ Guest House হইতে বিছানাপত্র দিবার ব্যবস্থা নাই এবং Private বাড়িতেও আত্মীয়স্বজন উৎসব উপলক্ষে আসিবেন, পূর্ব হইতেই যতদূর জানি স্থির আছে। এরূপ অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে যাইয়া প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র না - লইয়া কোনো ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে বিব্রত করা হইবে ও বিব্রত করিয়াও কোনো লাভ হইবে না।

যাই হোক, এত ডিফিকালটি সত্বেও যদি আপনারা শান্তিনিকেতনে যাইতে চাহেন তাহা হইলে সোজাসুজি শান্তিনিকেতন সচিবকে চিঠি দিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। সচিবের ঠিকানা ঃ Santinikektan Sachiva, Santikikentan, P.O.,E.I.Ry. Loop (Birbhoom.)

উৎসব সময়ে কাহারো এ্যাকোমোডেশনের জন্য সচিবকে অনুরোধ উপরোধ করার দায়িত্ব লওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি উৎসবের সময় নিজের কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকিব। সে সময় অন্যদিকে মন দেওয়ার সময় থাকে না। চিঠিটা অপ্রিয় - সত্য কথায় লিখিলাম এইজন্য যে যাহাতে শীতকালে উৎসব সময়ে বোলপুর যাইয়া আপনারা কষ্ট এবং দুর্ভোগ না সহ্য করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এ সময় আপনার অনুরোধ রক্ষার কোনো দায়িত্ব লওয়া বাস্তবিকই আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এজন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

ইতি
বিনীত
শ্রী সুধাকান্ত রায়চৌধূরী

এ চিঠি আমাদের অবশ্য কিছুমাত্র নিরুদ্যম করতে পারেনি। সব রকম ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, যথাসময়ে আমরা ঝাড়া হাত পায়ে পদব্রজেই বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। অচেনা পল্লীবাসীদের আতিথ্য কুড়িয়ে, পুরো তিনদিন ধ'রে পথ হেঁটে, পায়ে বহু ফোসকার জ্বালা- যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে, এক সময়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছনো গেলো। এবং সুধাকান্তবাবুর অপ্রিয় - সত্যে ভরা চিঠিতে আমাদের হতোদ্যম করবার জন্য যতবিধ অধ্যবসায় জমা করা থাকুক না কেন, আশ্রমে পৌঁছিয়ে, মাটির মেঝেতে খড় বিছানো এক কুটিরে, দুখানা পুরু কম্বলের তলায় অতি চমৎকার আশ্রয় এবং আতিথ্য আমাদের ঠিকই জুটেছিলো। ভোর রাতে উঠে বৈতালিকের দলে জুটে প্রাণ ভ'রে গান শুনেছিলামঃ

'আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে, ওই বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।'

পরে শুধু এই ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো যে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাওয়া এবার হয়তো সম্ভব হবে না, কেননা বেলা হলে ঘুরতে ঘুরতে এক ফাঁকে দেখে এলাম যে উত্তরায়ণের সমস্ত প্রবেশদ্বারেই আগল দেওয়া। সদ্য কঠিন অসুখ থেকে উঠেছেন কবি, কারো পক্ষেই তখন তাই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া ছিলো অসম্ভব।

উত্তরায়ণের চতুর্দিক তখন পর্যন্ত, এখনকার মতো, লোহার জালের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা ছিলো না। আমি খোঁজ পেয়েছিলাম

যে উত্তরায়ণে উত্তর প্রান্তে উদীচী নামের ছোটোখাটো, অতি সুদৃশ্য একটি অসাধারণ গড়নের বাড়িতে তখন আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৯ সালের আদ্যিকালে চারিদিক খোলা সেই বাড়িটির দিগন্ত অবধি ফাঁকা ছিলো তখন পর্যন্ত। প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে, কাঁটা গাছের চওড়া বেষ্টনী অতিক্রম ক'রে, সে বাড়ির কাছাকাছি কোথাও গিয়ে পৌঁছনো ছিলো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সত্যি কি সবার পক্ষেই নিতান্ত অসম্ভব ছিলো কাজটা?

উত্তরায়ণ আর রতনকুঠির মাঝখান দিয়ে যে-রাস্তাটা শ্যামবাটির দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে অবসন্ন মনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার চোখে পড়ে — কাঁটা গাছের বেড়ার তলা দিয়ে ওরই মধ্যে এক জায়গায় অল্প খানিকটা ফাঁকা তৈরি হয়েছে, আশ্রম সারমেয়দের আসা যাওয়ার নিজস্ব গলিপথ হয়তো ছিলো সেটি। উত্তরায়ণে প্রবেশের বন্ধ দ্বারগুলো যেন মুহূর্তে খুলে গেলো আমার চোখের সামনে। তারপর থেকে পরপর যা-কিছু ঘটে চললো তার কোনটার জন্যই কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না আমি। দেখা গেলো, উত্তরায়ণের প্রশস্ত আঙিনার কোথাও কী কারণে সে সময় কোনো প্রহরী উপস্থিত নেই। ১৯৩৯ সালের আদ্যিকালেও সেটা ঠিক প্রত্যাশা করবার মতো স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। বেড়ার তলাকার ফাঁকা দিয়ে কুকুরের মতোই হামাগুড়ি দিয়ে অনায়াসে আমি ভিতরে ঢুকে যাই। লক্ষ্য করি যে শীতসন্ধ্যার প্রাক্কালে উদীচীর দ্বিতলের বারান্দায় ধীর পদক্ষেপে একাকী যিনি পদচরণ করছেন তিনিই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুঃসাহসে ভর করে উদীচীর সিঁড়ি দিয়ে আমি দোতালায় উঠে যাই। রবীন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখলেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন যে নিয়মভঙ্গকারী ভ্রষ্টাচারী কোনো তরুণ যুবক, প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে অগম্য এই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। তিনি বিচলিত হলেন না। পদচারণ স্থগিত করে, মৃদু হেসে, প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। অনুমান করে জিগ্যেস করলেন — আমিই সে ছেলেটি কিনা, কলকাতা থেকে বন্ধুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে যে পৌষমেলায় বোলপুর অব্দি চলে এসেছে। কী করে জানলেন? পরে জেনেছি, আশ্রমের রীতি অনুযায়ী সচিবদের কেউ এসে দিনের শেষে প্রত্যহ সারাদিনের বৃত্তান্ত জানিয়ে যেতেন কবিকে। বিশ শতকের কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে কোনো তরুণ যে শীতের পৌষমেলা দেখতে বোলপুরে চলে আসতে পারে সেটা বোধকরি কবিকে জ্ঞাপন করার মতো একটা বিরল ঘটনাই ছিলো তখন। অর্থাৎ আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের খবর কবি আগেই শুনে ফেলেছিলেন।

মহাযুদ্ধের আগে কোনো আত্মীয়ের কাছে থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া পাঁচ টাকারও কম দামের 'বেবি ব্রাউনী' নামের ক্ষুদ্রকায় একটি কোডাক ক্যামেরার মালিক ছিলাম আমি। কিন্তু রবীন্দ্রসমীপে পৌঁছনোর সময় সেটি তখন সঙ্গে ছিল না। গোপনে অকস্মাৎ এভাবে যে কবিদর্শন ঘটে যাবে তা তো সত্যি আমি ভাবিনি আগে। কাজেই পরের দিন ক্যামেরাটি সঙ্গে নিয়ে এসে তাঁর একটা ছবি তোলার অনুমতি সসঙ্কোচে প্রার্থনা করতে হলো, এবং এক কথাতেই রাজী হলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে পরদিন সকালেই যেহেতু তিনি কলকাতায় চলে যাচ্ছেন, কাজেই ভোরের ট্রেনের সময় জেনে নিয়ে আগেই যেনে চলে আসতে বিলম্ব না করি আমি।

এইসব কথাবার্তা চলার মধ্যেই বাইরের সিঁড়িতে ভারী চটির আওয়াজ শুনেই আমি অনুমান করি যে ধরা পড়ে গেছি, নিশ্চয়ই সুধাকান্তবাবু এতক্ষণে জানতে পেরে গেছেন যে তাঁর আদেশ অমান্যকারী সেই উদ্ধত তরুণটিই বোধকরি কোনো অদ্ভুত উপায়ে রবীন্দ্রসমীপে উপনীত হয়েছে। তাঁর পাশ কাটিয়ে উদীচী থেকে দ্রুত পলায়ন করতে গিয়ে কবির মুখে প্রশ্রয়ের প্রসন্ন হাসির ছটা দেখতে পেয়েছিলাম, সে কথা ভুলিনি।

পরদিন সকাল। উত্তরায়ণে উপস্থিত হয়ে সুধাকান্তকে করুণভাবে নিবেদন করি যে কত কালই স্বয়ং গুরুদেব তাঁর একটা ছবি তোলার অনুমতি আমাকে দিয়েছেন, এবার শ্রদ্ধাস্পদ সচিব মহাশয়ের সানুগ্রহ ডিক্রি পেলেই আমার অভিলাষটি পূর্ণ হয়। সচিব মহাশয় নিতান্ত কঠোরভাবেই সে প্রার্থনা নামঞ্জুর করে দিলেন। সংক্ষেপে বললেন—'হবে না।' এদিকে বোলপুরের ট্রেনের সময় ক্রমে ঘনিয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের হাম্বার গাড়িটি দেখলাম উদীচীর সামনে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ দেখা গেলো প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ শহীদুল্লা সাহেব তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুতপদে উদীচীর সিঁড়ি বেয়ে কবির সন্নিধানে উঠে গেলেন। নিশ্চয়ই পূর্বেই সব স্থির করা ছিলো। সঙ্গে এনেছেন পেল্লায় ক্যামেরা কাঁধে পেশাদার এক ক্যামেরাম্যান, আঙিনায় ক্যামেরা খাটিয়ে যিনি ছবি তোলার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। আজ্ঞা পাওয়ার আশায় তখনো আমি সুধাকান্তবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্রমে দেখা গেলো— উদীচীর সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সঙ্গে নামছেন ডঃ শহীদুল্লা এবং তাঁর ছাত্র সম্প্রদায়। তখন আর সহ্য করা গেলো না। সচিবের ভ্রুকুটি সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করে, ক্ষুদ্র 'বেবি ব্রাউনী'টি হাতে নিয়ে ছুটে চলে গেলাম উদীচীর সামনে, যেখানে দাঁড়িয়ে পেশাদার আলোকচিত্রীটি ঐতিহাসিক একটি ছবি তুলতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁকে অশোভন ভাবে পাশ কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথের আরো সমীপবর্তী হ'তে হ'লো আমাকে, নয়তো আপেল আকারের ও আকৃতির 'বেবি ব্রাউন' ক্যামেরার সাহায্যে সুস্পষ্ট কোনো ছবিই বোধকরি তোলা যেতো না। জানি না— ডঃ শহীদুল্লার সঙ্গে আসা পেশাদার সেই ক্যামেরাম্যানের পেশার কাজের আমি কোনো বিশ্রী ব্যাঘাত করেছিলাম কিনা। তাঁর তোলা সে ছবি আমি কদাচ দেখিনি। মনে পড়ে, গাড়িতে উঠতে গিয়ে হেসে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো সতর্ক করেছিলেন আমাকে— 'গাড়ি চাপা পড়বে নাকি গো'? দেখতে-দেখতে তাঁর হাম্বার গাড়িটি গোযান চলার উপযুক্ত ধূলিধূসর বোলপুরের সড়ক ধরে মিলিয়ে গেলো।

দমদমের ঘুঘুডাঙ্গায় থাকতুম তখন। সেখানে চেনা ছিলো এক ক্যামেরাশিল্পীর সঙ্গে, যিনি ছিলেন স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার উঁচুদরের এক ছবি তুলিয়ে। শহরে ফিরে তাঁরই শরণাপন্ন হলাম। ভয় ছিলো ছবিটি সত্যি - সত্যি ক্ষুদে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে কিনা। প্রিন্ট দেখে সব সংশয় দূর হয়ে গেলো। 'বেবি ব্রাউনী' আমাকে নিরাশ করেনি।

কবির তখনকার সচিব ছিলেন অনিলকুমার চন্দ। ছবির এক কপি রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রার্থনা জানালাম—কবি যদি ছবিখানার স্বাক্ষর করে দেন তবে আমি ধন্য হই। প্রায় বৎসরকালের মধ্যে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না শান্তিনিকেতনের দিক থেকে। সব আশা ভরসা যখন জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি তখন হঠাৎ একচল্লিশ সালের চব্বিশে জানুয়ারি তারিখে লেখা অনিলকুমারের একখানা অপ্রত্যাশিত চিঠি এসে পৌঁছলো ঘুঘুডাঙ্গায়। চিঠিখানি এই ঃ

24.1.41

SANTINIKENTAN
BENGAL, INDIA

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠিখানি, নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার অফিসের টেবিলে নানা পুরনো কাগজপত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই এতদিন কোনো উত্তর দিতে পারিনি। আজ হঠাৎ আমার একজন সহকারী আবিষ্কার করেছেন। দোষ সর্বথা আমার, তবে অনিচ্ছাকৃত। দয়া করে ক্ষমা করবেন, এই প্রার্থনা।

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠেননি— এখনো চিকিৎসা চলেছে জোর। নিজের ঘরেই বন্দীর জীবন কাটাচ্ছেন। চিঠিপত্রের ব্যবহারের অনুমতি এখনো পাননি। তবে আপনার ছবিখানায় স্বাক্ষর করবেন। আপনি বেরিয়ে পড়েছেন কিনা না জানাতে এই সঙ্গে পাঠালাম না— পাছে হারিয়ে যায়। আপনি যদি এখনো ঘুঘুডাঙ্গার ঠিকানায় থেকে থাকেন, দয়া করে একছত্র লিখে জানাবেন। অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবো।

আবার ক্ষমাভিক্ষা করে বিদায় নিচ্ছি।

ইতি
ভবদীয়
শ্রী অনিলকুমার চন্দ

রবীন্দ্রনাথের কাঁপা হাতে স্বাক্ষর করা আমার তোলা সেই ছবিটি অবিলম্বেই এসে পৌঁছলো ঘুঘুডাঙ্গায়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে। তার ঠিক সাত মাস পরেই চিরদিনের মতো চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩৪৮ সনের বাইশে শ্রাবন।

কবি স্বাক্ষরিত সেই অমূল্য ছবিখানি আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সতর্ক দৃষ্টি থেকে কেউ হয়তো গোপনে তার অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু এতকাল পরেও ছবির নেগেটিভটি হারায়নি এবং অক্ষতই আছে। এখনো তা থেকে নতুন প্রিন্ট ছাপিয়ে নেওয়া যায়, যেমন এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমার অনুমোদনক্রমে সেই নেগেটিভ থেকেই ছবি প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছেন। আমার অনুমতি ব্যতীত এ-ছবি কারো পক্ষে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। এই প্রথবারই ছবিটি কোথাও প্রকাশিত হলো।

ছবিতে রবীন্দ্রনাথের পিছনে দাঁড়ানো বিরলকেশ ভদ্রলোকটিই আমাদের সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, যেমন তাঁকে দেখতে ছিলো ১৯৩৯ সালে।

অনেক আগেই তিনি গত হয়েছেন।